নানা অমরেন্দ্র

শঙ্খ ঘোষ

মহাশ্বেতার একটি চিঠি এসে পৌঁছল হঠাৎ। লিখেছে: 'আগামী মার্চে বাবার ৮০ বছর পূর্তি। এই উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য বইয়ে আপনার দু'টি লেখা পুনর্মুদ্রণ করছি। পর্ব-শিরোনাম সহ দু'টি পর্বে সাজিয়ে পুরো লেখাটির নাম দিয়েছি "'কবিতা-পরিচয়'-এর অমরেন্দ্র"। আপনাকে পাঠালাম। আপনি যদি শিরোনামটা আপনার ভাবনা-মতো ঠিক করে দেন, ভালো হয়।'

শিরোনাম ঠিকই আছে, কিন্তু চমকে উঠেছিলাম উদ্ধৃতাংশের প্রথম লাইনটা পড়ে। অমরেন্দ্রও আশি? মনে পড়ছে, এই তো সেদিনকার কথা, যখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের তরুণ এক ছাত্র হঠাৎ একদিন বাড়িতে এসে বলেছিল: 'আমরা একটা পত্রিকা বার করব ঠিক করেছি। আপনার সাহায্য চাই।'

নবোদ্যমে নতুন এক লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদনা করে প্রবহমান গোটা সাহিত্যের ধারাটাকে পালটে দেবে, সেই বয়সে এরকম একটা ইচ্ছে না-হওয়াটাই আশ্চর্যের। তাই তার কথা শুনে ততটা বিস্মিত হইনি। কিন্তু একই সঙ্গে বিস্মিত আর উত্তেজিত বোধ করেছিলাম তার পুরো পরিকল্পনার কথা জেনে। প্রায় যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে আর দৃঢ় প্রত্যয়ে সে বোঝাচ্ছিল তার পত্রিকার লক্ষ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে করতে সাহিত্যবিচারের যে ধাঁচ দেখতে পাই আমরা, সেটা কি আমাদের কবিতার কোনো যথার্থ বোধের পরিচয় দেয়? দেয় না যে, সেটা প্রমাণ করার জন্যই আমাদের পত্রিকায় থাকবে শুধু এক-একটি কবিতা ধরে এক-একজনের পাঠ। একটি কবিতা কীভাবে কবিতা হয়ে উঠছে, কী তার রহস্য— এইসব নিয়ে কথাবার্তা থাকবে সে পত্রিকায়।

সমাপতন বলে একেই। কিছুদিন ধরে অলোক অশ্রু আর আমি প্রত্যক্ষ সংলাপে বা চিঠিপত্রে এসব নিয়েই কথা বলছিলাম। কিন্তু তা নিয়ে সরাসরি কোনো পত্রিকা প্রকাশের কথা ভাবতেও পারছি না। কেননা, তার জন্য টাকাপয়সা মিলবে কোথায়? এ কি তবে বেশ ধনী পরিবারের ছেলে? জিজ্ঞেস করেছিলাম: 'আর্থিক সংগতি আছে?'

অকুতোভয় ছেলেটি বলেছিল: 'বাড়ি থেকে কলেজে আসবার জন্য কিছু হাতখরচ পাই আমি। সেটা দিয়েই হয়ে যাবে কোনোমতে।'

শুরু হয়ে গেল নতুন এক পত্রিকা। তিরিশের দশকের প্রধান দু'টি পত্রিকা 'পরিচয়' (১৯৩১) আর 'কবিতা' (১৯৩৫) নামদু'টি মিলিয়ে নিয়ে শুরু হল অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর 'কবিতা-পরিচয়' (১৯৬৬)।

মহাশ্বেতা আমার যে-দু'টি লেখা ছাপতে চাইছে, তার মধ্যে অবশ্য এইসব কথাই আছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের দু'টি লেখা, একটি ২০০২ সালের অন্যটি ২০০৬-এর। তার মানেটা এই যে প্রায় চার দশক অতিক্রম করার পরেও অমরেন্দ্র-অভিঘাত কতটাই রয়ে গেছে আমার মনে। তার আশি বছর পূর্তির শুভেচ্ছা উপলক্ষ্যে লেখাদু'টির ব্যবহার তাই অসংগত হবে বলে মনে হয় না। শুধু এ-দু'টি লেখাতেই নয়, 'কবিতা-পরিচয়' নিয়ে আমার বিহ্বলতার প্রকাশ আছে আরো। একটি যেমন 'আর এক আরম্ভের জন্য' (১৯৮৯) লেখাটিতে, যা পরে গ্রন্থায়িত হয়েছে 'এখন সব অলীক' বইটির (১৯৯৪) মধ্যে, আর সেই ১৯৯৪-তেই 'কবির অভিপ্রায়' নামের একটি বইতে, সবকটি লেখার মধ্যে যেটি দীর্ঘতম।*

কিন্তু কোন্ অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে তাঁর আশি বছর পূর্তির জন্য শুভেচ্ছা জানাতে চাইছি আমি? অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কি একজন? ষাটের দশকে তিনি 'কবিতা-পরিচয়'-এর জন্য খ্যাত হন, অথচ আড়ালে চলে যায় তাঁর নিজের কবিতার পরিচয়। সেই কবিও তো ধারাবাহিকভাবে আজও লিখে চলেছেন কবিতা। না কি অমরেন্দ্র চক্রবর্তী হলেন সেই শিশুসাহিত্যিক যাঁর 'হীরু ডাকাত'-এর মতো অনবদ্য সৃষ্টি বছরের পর বছর ছোটোবড়ো সবারই মনোরঞ্জন করে চলেছে? শুধু 'হীরু ডাকাত'ই নয় অবশ্য, গদ্যে কিংবা ছন্দে বাঁধা তাঁর আরো অনেক রচনাই বড়োমাপের এক শিশুসাহিত্যিক হিসেবেই সাহিত্যসমাজে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। না কি আমরা সেই অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর কথা ভাবছি যিনি যুবসমাজের কর্মহীনতার জন্য তাঁদের কোনো দিশা দেখাবার কাজে 'কর্মক্ষেত্র'-র মতো মুক্তিপথের কাণ্ডারী হয়ে উঠেছিলেন? না না, ইনি হলেন একজন ভ্রমণপিপাসু মানুষ যিনি পর্যটনজগতের উন্নয়ন ঘটিয়েছেন 'ভ্রমণ' নামে এক জনপ্রিয় পত্রিকার মধ্য দিয়ে, যে-পত্রিকা পরবর্তী কোনো সময় থেকে সঙ্গে দিত বিনেপয়সায় একটা সিডি, কোনো-না-কোনো দেশের পর্যটনের ভিডিও। ইনি কি সেই অমরেন্দ্র, নিজে যিনি উত্তর থেকে দক্ষিণমেরু পর্যন্ত কিংবা পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত দুর্গমতম অঞ্চলগুলিতে ঘুরে বেড়িয়েছেন সমস্ত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে? না, আরো এক অমরেন্দ্র আছেন, যিনি হঠাৎ মধ্যবয়সে পৌঁছে ছবি আঁকা শুরু করেন আর সেটাই যেন হয়ে দাঁড়ায় তাঁর অন্যতম প্রধান নেশা। সেই চিত্রশিল্পীর কথা হচ্ছে কি এখানে? না কি আমরা বলছি সেই স্বপ্নভাবুক মানুষটির কথা, যিনি 'ছেলেবেলা'-র মতো পত্রিকা বা পরে 'কালের কষ্টিপাথর' নামে বড়োদের এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?

এটা হওয়াই সম্ভব যে, কোনো একজন মানুষ এতগুলি অমরেন্দ্র চক্রবর্তীকে একই লোক বলে মনে করেন না। অন্তত আমার নিজের তো মনে হয় অমরেন্দ্র যেন একই সঙ্গে 'নানা অমরেন্দ্র'।

** এই লেখাদুটিও এখানে আংশিক সংযোজিত হল*

তাই, শুধু 'কবিতা-পরিচয়'-এর অমরেন্দ্রকে নয়, আমি আজ আশি বছর পূর্তির শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা জানাই সেই 'নানা অমরেন্দ্র'-কে। আর সেইসঙ্গে 'ক্ষণকথক'-কেও, যিনি 'ক্ষণের বচন' নাম দিয়ে নানারকমের সূক্তি রচনা করে চলেছেন দিনের পর দিন।

১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ **শ্রুতিলিখন। কৃতজ্ঞতা: স্নেহাশিস পাত্র**

কবিতার পরিচয়

একজন সদ্যতরুণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া তখনও সাঙ্গ হয়নি তাঁর, একটি পত্রিকার পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন একদিন, ১৯৬৬ সালে। এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই, কেননা ওই বয়সটাই নানারকম দুঃসাহসিক পরিকল্পনা নিয়ে মেতে উঠবার সময়। বিস্ময় ছিল তাঁর ভাবনার নতুনত্বে। সেই তরুণের—অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর—মনে হচ্ছিল, একটি মাসিক পত্রিকার দরকার যেখানে কেবল কবিতা পড়বার পদ্ধতি নিয়েই কথা হবে। এক-একটি কবিতা নিয়ে কথা বলবেন এক-একজন। কীভাবে তিনি পড়েছেন সেই কবিতা, বলবেন শুধু সেইটুকুই, আর কিছু নয়। তারই জন্য চাই একটা মাসিকপত্র।

অশ্রু অলোক আর আমার তখন মনে হলো এ এক কাকতালীয় সংযোগ। কবিতা নিয়ে যেভাবে আলোচনা চলছে অনেকদিন ধরে, তার অপূর্ণতা অসংগতি আর নিষ্ফলতা বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তখন কথা বলছি আমরা, কথা বলছি আমাদের ক্লাসে-পড়ার বা ক্লাস-পড়ানোর দুরভিজ্ঞতা নিয়েও। অনেক দার্শনিক ঐতিহাসিক সামাজিক গূঢ়তার চাপে আলোচনা থেকে মূল কবিতাটাই হারিয়ে যায় কখন, আমরা কথা বলছি তা নিয়ে। *The Poem Itself*-নামে স্ট্যান্‌লি বার্নশ-র বইটি তখনও হাতে পৌঁছোয়নি আমাদের, কিন্তু কবিতাবিচারে আমরা পেতে চাইছি সেইরকমই কবিতার কোনো নিজস্ব সত্তার পরিচয়, ভাবছি ভিন্নরকমের কোনো আলোচনাপদ্ধতির কথা।

অমরেন্দ্রর প্রস্তাবে তাই মেতে উঠলাম আমরা। প্রথম সংখ্যারই আয়োজনে সঙ্গে এসে মিললেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত আর অরুণ সেন। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত, কখনো-বা সম্পূর্ণ রাত, অমরেন্দ্র তখন বাড়িছাড়া। ক্লেশহীন ঘুরে বেড়াচ্ছেন নাকতলা থেকে শ্যামবাজার, ছেড়ে দিয়েছেন ক্লাস-পড়ার দায়। থাকছেন অনেকসময়ে অর্ধাশনে। আর শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই একদিন শুধুমাত্র পাঁচটি কবিতার পাঁচটি আলোচনা নিয়ে দেখা দিল 'কবিতা-পরিচয়' নামের ছিমছাম একটি পত্রিকা, বৈশাখের এক গরম দুপুরে। আর, আশ্চর্য, প্রথম সংখ্যা থেকেই তার কপালে আদরও জুটল অনেক। মনে হলো অনেক পাঠকেরই যেন মনে মনে অগোচর এক প্রতীক্ষা ছিল এমন কোনো পত্রিকার জন্য।

সেই পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যাটি (শ্রাবণেই বেরোতে পারল কিন্তু সেই চতুর্থ) বেশ বড়ো রকমের মর্যাদা পেয়ে গেল কেবল আবু সয়ীদ আইয়ুবের এক দীর্ঘ প্রবন্ধের জন্য। প্রথম দুটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা নিয়ে কথা বলেছিলাম আমি, সেই সূত্র ধরে আইয়ুব যা লিখলেন তাকে বিস্তারিত এক প্রতিবাদপ্রবন্ধই বলা যায়।

‘কবিতা-পরিচয়’ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাপ্তাহিক ‘দেশ’-এও ছাপা হলো সেই লেখা, ফলে আমাকেও তার উপরে লিখতে হলো একটা। তারও পরে আইয়ুবের প্রত্যুত্তর, আমার প্রতিপ্রত্যুত্তর—এমনভাবে চলল কিছুদিন ‘কবিতা-পরিচয়’ আর ‘দেশ’ পত্রিকায় সমান্তরাল ভাবে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার আস্বাদন নিয়ে—কিংবা বলা যায় তাঁর কবিতার মূল্যায়ন নিয়ে—ঈষৎ মতভেদ হচ্ছিল যে আমাদের, ওই বিতর্কে সেটাই একমাত্র কথা ছিল না। কথা ছিল কবিতা পড়বার প্রকৃতি নিয়েও, কবিতা বিচার করবার কলাকৌশল নিয়েও। ফলে এ-তর্ক শুধু দুই ভিন্ন রুচির তর্ক নয়, হয়ে দাঁড়াল দুই ভিন্ন পদ্ধতির তর্ক। অনেকেরই নজর তাই পৌঁছল এ-বিতর্কে।

(আংশিক)

লেখকের ‘সামান্য অসামান্য’ (দ্বিতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০০৮) থেকে গৃহীত

কোথায় পায় টাকা

বিকেলে অলোকের সঙ্গে কথা বলছি ঘরে বসে, হঠাৎ বেজে উঠল ঘন্টি। দরজা খুলে দেখি সুনীল। বাঃ, এ তো ভালো হলো, দুয়ের চেয়ে তিনে শুনেছি আড্ডা জমে ভালো। কিন্তু লম্বা বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকবার আগের মুহূর্তেই একটা ভয়ও ঢুকল মনে। জমবে, না কি ভাঙবে? সুনীল-অলোকের মুখোমুখি হয়ে যাওয়াটা এই মুহূর্তে কি ঠিক হবে? কোনো অপ্রিয়তা হবে না তো?

ভয়ের কারণটা হলো, কয়েকদিন আগেই ‘কবিতা-পরিচয়’ নামের এক পত্রিকায় ওদের বেশ দ্বৈরথ ঘটে গেছে। সুনীলের লেখা কোনো-একটি কবিতাবিচার পড়ে অলোক তার আদ্যন্ত বিরোধিতা করেছে, ওই লেখাকে তার মনে হয়েছে নিতান্তই ‘সপ্রতিভ’ এবং ‘অগভীর’, আর এই ‘মৃদু ভর্ৎসনা’কে সবিনয়ে ‘শিরোধার্য’ করে নিয়ে সুনীল লিখেছেন তার এক জোরালো এবং স্মরণীয় উত্তর। ঘটনাচক্রে, যে-কবিতাটি নিয়ে এই বিসংবাদ, সেটি ছিল আবার আমারই লেখা।

এখন কী হবে? দুজনের থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকবে দুজন? আড়ে আড়ে কথা হবে? না, হলো না তেমন কিছু। দেখা হতেই অলোক সহাস্যে বলে: ‘পড়েছি আপনার জবাব।’ সুনীলের ঠোঁটে সামান্য একটু লাজুক হাসি: ‘ইচ্ছে করলে আপনিও আবার লিখবেন।’ তার পর শুরু হয় স্বাভাবিক গল্পগুজব। কবিতা কাকে বলে, কীভাবে পড়া উচিত কোনো কবিতা, এ নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন রুচির মানুষ এই দুজন সমকালীন কবি, কিন্তু তাতে কি বন্ধুত্বের কোনো বাধা হয়? হওয়া ঠিক? হয় না যে সেটা, তা তো দেখাই গেল এখানে। আর, তারই একটা প্রকাশ্য রূপ তখন ফুটে উঠছে সেই পত্রিকাটিকে ঘিরে, ‘কবিতা’ আর ‘পরিচয়’ নামদুটিকে জড়িয়ে যে-পত্রিকার নাম হয়েছে ‘কবিতা-পরিচয়’, যে-পত্রিকায় একই কবিতাকে ভিন্ন ভাবে পড়ছেন ভিন্ন ভিন্ন মানুষ। জমে উঠেছে, একই সঙ্গে, কবিতা পড়ার আর বন্ধুজনদের মধ্যে তর্কবিতর্কের স্বাদু এক পরিবেশ।

আর এসব ঘটিয়ে তুলছে তখন অমলিন এক স্বপ্নদ্রষ্টা যুবক। যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্যের পড়াশোনা করতে করতেই তার নেশা ধরে গেছে একটা কোনো পত্রিকার ভাবনায়, যা হয়ে উঠবে 'কাব্য-সমালোচনার মাসিক সংকলন'। খুবই এর দরকার বলে মনে হচ্ছিল তার, কেননা কবিতাকে যে কেবল কবিতা হিসেবেই পড়া যায়, পড়ে আনন্দ পাওয়া যায় বা আলোড়িত হওয়া যায়, তার সৃষ্টিসূত্রের কথা ভেবে উত্তেজিত হওয়া যায়, আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য পড়ে তা যেন আর বোঝাই যায় না। কোনো কি পথ তৈরি হতে পারে না সে-বোধের দিকে? এ-রকম এক ভাবনা নিয়ে তরুণ ওই ছাত্র তার উদ্যমে আর উৎসাহে তখন গড়ে তুলছে সমভাবুকদের এক দল, যে-দলে প্রায় সকলেই তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো।

সফলও হলো তার স্বপ্ন। বড়োমাপের কাগজের ষোলো পৃষ্ঠা, নিরাভরণ ঘিয়ে রঙের মলাটে শাদাসিধে হরফে নামটা শুধু ছাপা, ভেতরে পাঁচটি মাত্র কবিতার আলোচনা। এক গরমের দুপুরে সেই পত্রিকাটি বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যাশিত আদর হলো তার, চিঠি বা প্রশ্রয় বা তর্ক নিয়ে উপযাচক হয়ে এগিয়ে এলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণু দে বা অম্লান দত্তের মতো মানুষজনেরা। সফলতায় দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। সেই যুবক অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর চোখে আর ঘুম নেই, পায়ে আর বিরাম নেই, নতুন নতুন ভাবনার আর ক্ষান্তি নেই।

কিন্তু সফলতা, স্বভাবতই, অনেক অহেতুক সংশয় বিদ্বেষ আক্রমণও সঙ্গে নিয়ে আসে। দুটো সংখ্যা বেরোতে-না-বেরোতেই, বিষ্ণু দে আর সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতা নিয়ে আলোচনা থাকা সত্ত্বেও, কথা চলতে থাকে এর প্রচ্ছন্ন সাম্যবাদ-বিরোধিতার মতলব নিয়ে। আবার সেই একই সঙ্গে, তিনটে সংখ্যা গড়িয়ে গেলেও কেন সুধীন্দ্রনাথের দেখা পাওয়া যায় না, এর ভেতরকার নিহিত গূঢ় অভিসন্ধিটা কী হতে পারে, এই নিয়েও প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। পত্রিকার ক্ষীণতনু সম্পাদকীয়তে একথা শেষ পর্যন্ত লিখতে হলো যে 'আশা করি কোনো পাঠক এতে সুধীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের উদাসীনতা অনুমান করবেন না।' মন্তব্যটি ছাপবার আগেই অবশ্য দপ্তরে এসে গিয়েছে তাঁর 'নৌকাডুবি' কবিতাটি নিয়ে স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুর দীর্ঘ রচনা।

পর-পর সুধীন্দ্রনাথই যদি দেখা দিতে থাকেন— আর হয়ে উঠলও সেটা— তবে তো আরেক বিপদ। 'হিটলারের সুহৃদ স্টালিন' লিখেছিলেন যে-সুধীন্দ্রনাথ, স্পষ্টতই মার্কসবাদবিরোধী যে সুধীন্দ্রনাথ, যাঁকে নিয়ে আলোচনা করে যাচ্ছেন বুদ্ধদেব বসু অরুণকুমার সরকার বিনয় মজুমদারের মতো মানুষেরা, তাঁর এই অতিপ্রাধান্য কি বুঝিয়ে দেয় না যে এর মধ্যে একটা কমিউনিস্ট-বিরোধী চক্রান্ত আছে, আছে সি আই এ-র কালো হাত?

যাদবপুরে একই ঘরে আমাকে বসতে হয় আমার মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে, দেবীপদ ভট্টাচার্য তাঁর নাম। কলেজীয় ছাত্রজীবনের সূচনা থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক, আমার আর অলোকের ওপর দীর্ঘকালীন এক স্নেহ আছে তাঁর। একদিন সেই দেবীবাবুর টেবিলের উলটোদিকে বসা জিজ্ঞাসু এক ছাত্রকে তিনি বোঝাচ্ছিলেন 'কবিতা-পরিচয়'-এর ক্ষতিকারক দিকগুলি, বোঝাচ্ছিলেন এর সি আই এ দূষণ তত্ত্ব।

পাশের টেবিল থেকে মাস্টারমশাইয়ের দিকে বিহ্বল তাকিয়ে থাকি আমি। ছেলেটি উঠে যাওয়ার পর বিহ্বলতর স্বরে জিজ্ঞেস করি: 'এ কি আপনি সত্যি বলে ভাবেন?' শান্তভাবে উনি উঠে আসেন আমার টেবিলের সামনে। বলেন: 'দেখো, অলোককে আর তোমাকে আমি কতটা ভালোবাসি তা তো জানো। আমি বলছি না যে তোমরা জেনেশুনে ও-পত্রিকার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছ। কিন্তু তোমাদের ভালোমানুষির সুযোগ নিচ্ছে অনেকে। এ-সংস্রব তোমাদের ঠিক হচ্ছে না। এটা তো একেবারেই সি আই এ-র ব্যাপার।'

'কীভাবে বোঝা যায় তা?'

'বোঝা যাবে না কেন? ভেবে দেখো না, কোথায় পায় এরা এত টাকা? কীভাবে চলে এ-রকম পত্রিকা? অমরেন্দ্র তো ছেলেমানুষ। এর পেছনে দেখছ না আইয়ুব বুদ্ধদেব অম্লান দত্ত? তা ছাড়া, সমালোচনার কোন্ রীতির প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এখানে? দাও তোমার খাতাটা— নকশা এঁকে বুঝিয়ে দিই।'

সত্যি সত্যি খাতা টেনে নিয়ে দাগ কেটে কেটে তিনি বোঝাতে লাগলেন আমাকে, কীভাবে সোশ্যালিস্ট রিয়্যালিজমের বিপক্ষতা করবার জন্য দেখা দিয়েছে নিউ ক্রিটিসিজম, নিউ ক্রিটিকদের উসকে দিয়ে কীভাবে সোভিয়েতের উলটোদিকে কাজ করছে আমেরিকা, কীভাবে সেই সূত্র ধরে কলকাতায় তৈরি হয়েছে সেন্টার ফর কালচারাল ফ্রিডম, আর কীভাবে আইয়ুব ইত্যাদির সঙ্গে গড়ে উঠেছে সেই সেন্টারের একাত্মতা। সেই আইয়ুবদের নিয়ে সেই নিউ ক্রিটিসিজমের ধাঁচে গড়ে উঠছে এই পত্রিকা। কাজেই, 'কবিতা-পরিচয়' যে সি আই এ প্রণোদিত, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না কিছু। 'বুঝতে পারছ না, টাকাটা আসছে কোত্থেকে?— কিছু বলবে তুমি?

অল্প একটু চুপ থেকে মাস্টারমশাইকে বলি: 'না, বেশি কিছু নয়। বলব শুধু টাকার কথাটা। এই ছেলেটি বাড়ির থেকে যে হাতখরচটুকু পায়, সেটুকু জমিয়ে জমিয়ে, অনেকসময়ে না-খেয়ে, কখনো কখনো এর-ওর বাড়িতে রাত কাটিয়ে, কলকাতার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে, নিরভিযোগ নিরভিমানভাবে সামান্য এই কাগজখানি যে করে যাচ্ছে, সেটুকু আমি বলতে পারি। কেননা, সেসবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে আমার, আমারও বাড়িতে সে থেকেছে কখনো কখনো। কাগজখানা করতে টাকাও যে খুব বেশি একটা লাগছে তা নয়, আর আলোচনারও তো কোনো নির্দিষ্ট একটা ছাঁচ নেই, লেখা ছাপা হয় অনেকরকমেরই।'

মাস্টারমশাই আবারও বললেন: 'বললামই তো আমি। ভিতরকার ব্যাপারটা তোমরা ঠিক বুঝতে পারছ না।' বলে, চলে গেলেন ক্লাসে।

লেখকের 'ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ' (তৃতীয় শোভন সংস্করণ জানুয়ারি, ২০১৮) থেকে গৃহীত

আর এক আরম্ভের জন্য

প্রদ্যুম্ন ছিলেন নীরব, কিন্তু তাঁর চারপাশে ছিল একটা সংগঠন। আর অন্যদিকে, প্রগল্‌ভ এক কলেজপড়ুয়া অমরেন্দ্র চক্রবর্তী তখন একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন

শ্যামবাজার থেকে নাকতলা, তাঁর পছন্দমতো কয়েকটি বাড়িতে, ভাবছেন আধুনিক কবিতা আলোচনার একটা আদর্শ গড়ে তুলবার কথা। প্রায় একক আয়োজনে, হাতখরচের পয়সা বাঁচিয়ে, পাঁচটি কবিতার আলোচনা নিয়ে নিরাভরণ একটি মাসিকপত্রিকা বার করলেন তিনি ১৯৬৬ সালের মে মাসে। 'কবিতা' আর 'পরিচয়'-এর দুই বিপরীত ঐতিহ্যকেই শিরোধার্য করে সে-পত্রিকার নাম হলো 'কবিতা-পরিচয়'। কবি বিষয়ে নয়, কবিতারই বিষয়ে আলোচনা-প্রত্যালোচনায় দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই বেশ জমে উঠল এই পত্রিকা, উপযাচক হয়ে লিখলেন আইয়ুব বা বুদ্ধদেবের মতো লেখকেরাও, আগস্ট-সংখ্যায় মন্তব্য করে পাঠালেন বিষ্ণু দে: 'আমরা কবিতা-র প্রতি মনোযোগ না দিয়ে যাতে কবির দর্শন-জীবনী-ইত্যাদি বিষয়ে মন দিই, সেই বিষয়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় সফলকাম। তাই এরকম চেষ্টা বিশেষ করেই সার্থক।'

(আংশিক)

লেখকের 'এখন সব অলীক' (চতুর্থ সংস্করণ, ২৫ বৈশাখ ১৪১৮) থেকে গৃহীত

লেখা

ঠিক আটাশ বছর আগে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের মনে হয়েছিল যে নতুন একটা পত্রিকা ছাপানো দরকার যেমন করেই হোক। গল্পকবিতার জন্য অভ্যস্ত কোনো লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন নয়, এমন একটা পত্রিকার সম্পাদনা দরকার যেখানে থাকবে শুধু কবিতার আলোচনা, একটি একটি কবিতার স্বয়ংতন্ত্র বিশ্লেষণ। একটিমাত্র কবিতা, তার চারপাশে আর কিছু নেই, এ-রকম অবস্থায় কোনো কবিতা কি তার অভিপ্রেত চাপ নিয়ে পৌঁছতে পারে পাঠকের কাছে? এরই একটা পরীক্ষা দরকার। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কবিতা থেকে শুরু করে তাঁর অনুজদের কবিতা পর্যন্ত যে গুচ্ছ তৈরি হয়েছে তিরিশ সালের পর থেকে, সে-কবিতা ঠিকভাবে পড়বার কোনো অভ্যাস কি দেখা গেছে আমাদের? কবির মনে হয় যেন পাঠক অনেক দূরে, পাঠকের মনে হয় কবিতা দূরে, কবিতারই কবিদেরই অন্তর্গত কোনো দুর্বলতা হয়তো সেটা, কিন্তু এদের কাছাকাছি এনে দেবার কোনো আয়োজন কি আছে কোথাও? সেই আয়োজন চাই, কবির কথা নয়, নিছক কবিতার কথা দিয়ে পাঠকদের বোঝাতে হবে কোথায় আছে কবিতা, কীভাবে পড়তে হয় কবিতা। এই ছিল সেদিন সেই তরুণ সম্পাদকের স্বপ্ন আর অ্যাডভেঞ্চার।

ধরা যাক এই একটি লেখা:

> ফুটপাতে ফোটে কৃষ্ণচূড়ার দিন
> বাঁকানো রোদের রেখাটি সাজানো ঘরে,
> কে বলে শহরে শুধুই জীবিকা, ঋণ;
> অমরাবতীও তোমারই কণ্ঠস্বরে।

বন্ধু জানায়, তুমি বহুবল্লভ,
তুমিই বলো না তাতে কিবা যায়-আসে;
পরিমাপ? সে তো বণিকেরা ভালোবাসে;
ক্লান্ত না হোক বাহুর মহোৎসব।

দুদিকে জানালা মধ্যে অন্ধগলি
ধোঁয়া পাক খায় সন্ধ্যার নিশ্বাসে
লক্ষ বুকের সখ্যের পদাবলি
দেয়ালে দেয়ালে মাথা কুটে ফিরে আসে।

হঠাৎ কখনো প্রমত্ত সংঘাতে
আশ্বিনে আসে ঝড়,
কেঁপে ওঠে তরী মাতাল ঝঞ্ঝাবাতে
জাগে নির্ভীক লক্ষ কণ্ঠস্বর।

সমুদ্রে নীল নির্জন আশ্বাসে
পাখিরা এনেছে কূজনমুখর দিন,
উপযাচকের মতো কেন ফিরে আসে,
কামনা আমার, অথই আমার ঋণ।

কার লেখা এ কবিতা? আপাতত অবান্তর করে দেওয়া যাক এই প্রশ্নটাকে। মূল প্রশ্ন হলো, এই লাইনগুলি— পূর্বাপর না জেনেও— কোথাও কি ছুঁতে পারছে আমায়? যদি তা ছোঁয়, লেখাটি কার তা জানবার পর কি সে-জানার প্রতিক্রিয়ায় হঠাৎ কোনো বদল হবে স্বাদের? অসম্ভব নয়, কারো কারো কাছে সত্যিও হতে পারে সেটা। অর্থাৎ তখন, লেখকের ব্যক্তিনামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, তাঁর রচনাবলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে, কবিতাটাও দৃষ্টিগোচরতা পেয়ে যায় হয়তো। কিন্তু লেখাটি যদি ভালো হয়, বা মন্দ হয়, সে তো নিজে-নিজেই ভালো বা মন্দ, এম্‌নি এম্‌নিই? লেখাটির মধ্য দিয়েই তো লেখাটির পরিচয় হবার কথা?

‘কবিতা’ আর ‘পরিচয়’, প্রসিদ্ধ এই দুই পত্রিকার নাম জড়িয়ে নিয়ে ‘কবিতা-পরিচয়’ নামে যে মাসিকপত্রটি ছাপাতে শুরু করলেন অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, তাতে অবশ্য লেখকনামহীন ভাবে কবিতাগুলি ছাপা হয়নি। আলোচকেরাও জানতেন কবির নাম, পাঠকেরাও জানতেন। কেবল চেষ্টা ছিল এইটে দেখানো, কীভাবে ছন্দের শব্দের প্রতিমার বিন্যাসে, কীভাবে তার ধ্বনির সর্বাত্মক সংগঠনে একটি রচনা পাঠকের অনেকটা অগোচরেই তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে পারে একটা যাথার্থ্যের বোধ, কীভাবে কেন্দ্রীয় কথার সঙ্গে তার ধরণটা ওতপ্রোত জড়ানো থাকে লেখায়।

অমরেন্দ্রকে, কিংবা কেবল অমরেন্দ্রকেই নয়, আমাদের একঝাঁক বন্ধুবান্ধবকে এমনকী আমাদের জ্যেষ্ঠদেরও অনেককে যে আকর্ষণ করছিল এই পদ্ধতিটা, সেও এক প্রতিক্রিয়াগত কারণে।

(আংশিক)

লেখকের ‘কবির অভিপ্রায়’ (চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১৪) থেকে গৃহীত

লেখক পরিচিতি
জ্ঞানপীঠ, কবীর সম্মান, সাহিত্য অকাদেমি-সহ বহু পুরস্কারভূষিত, সর্ব অন্যায়ের সদাজাগ্রত প্রতিবাদী কবি ও রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ